Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 407–424
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিতে লোকক্রীড়া : ঐতিহ্য ও স্মৃতির পরম্পরা

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়
ই-মেল : sriashim.biswas@gmail.com

Keyword
লোকক্রীড়া, বাঙালি সংস্কৃতি, শরীরচর্চা, হাডুডু, গুজিখেলা, নুনভাড়ি, ইচিং বিচিং, গোল্লাছুট, ডাংগুলি, সাতচাড়া, পানিঝুপ্পা, পাহুড়, চিঞ্চোরানি, বাচেলদার, সারিদার।

Abstract
বাঙালি বড়ই আত্মভোলা জাতি। স্মৃতির স্মরণী বেয়ে কত কিনা সে ভুলে গিয়ে পেছনে ফেলে অনেকটা পথ এগিয়ে আগামীর পথে হেঁটেছে এবং হাঁটছে। বাঙালি স্বাস্থ্য সচেতন কিনা সে প্রশ্ন বিতর্কেরই থেকে যাবে। কিন্তু শরীর এবং মনকে ভালো রাখার জন্য শরীরচর্চা এবং খেলাধুলা মানব জীবনের যে অপরিহার্য অঙ্গ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা যায়, তাহলে দেখা যায় প্রত্যেকটিক্ষেত্রে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি, বাঙালি তার প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসাবে বহু লোকজ খেলা ভুলতে বসেছে। অসংখ্য খেলা বাঙালির চিত্ত বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। কিন্তু আজ সেই সব খেলা বিলুপ্তির পথে। শুধু স্মৃতি হিসাবে রয়ে গেছে বাঙালির মনীষা ও মননে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাঙালি Indoor ও Outdoor সেই সমস্ত খেলাগুলিলি একেবারেই বিস্মৃত হয়ে যাবে। শুধুমাত্র স্মৃতি আর বাঙালির সত্ত্বা হিসাবে ভবিষ্যতের রোমন্থনের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। যে খেলাগুলো গৃহের অভ্যন্তরে এবং বাইরে শিশু, নারী-পুরুষ সকলেই জীবনের অঙ্গ করে তুলেছিল এক সময়ে, সেই খেলাগুলি বাঙালির সংস্কৃতি থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। এমনকি কতকগুলি খেলা আজ আর তেমন চোখে পড়ে না। আধুনিক সভ্যতা, দুরাভাষ, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, সমাজ-মাধ্যমের অঙ্গ হিসাবে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ আজ মানুষের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। মানুষ আজ পাশাপাশি বসে থেকেও কেউ কারোর খবর রাখে না। দুরাভাষে মুখ গুঁজে জীবন অতিবাহিত করছে। তাই মনে হয় যে, মানুষের হাতে একটুও সময় নেই শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য কিছুটা সময় খেলাধুলার সঙ্গে বিচরণ করার জন্য। সেই কারণেই হয়তো, আধুনিক ব্যস্ত জীবনযাপন ও জীবনযাত্রার ফলেই আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে বহু লোকক্রীড়া। আর তারই প্রেক্ষাপটে, আমি আমার এই গবেষণা প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, বাঙালি তথা বাংলার হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে বিভিন্ন লোকক্রীড়া বা গ্রামিণ খেলাধুলাগুলি সম্পর্কে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই খেলাগুলি একসময় উল্লেখযোগ্য

এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করত। আজ শুধুমাত্র কালের সাক্ষী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় তার নাম পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এই খেলাগুলি স্মৃতি হয়ে রয়েছে বাঙালির মননে। বয়ো:জ্যেষ্ঠ বাঙালির সত্তা হিসাবে এই খেলাগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে শুধুই যেন রূপকথা হয়ে থেকে যাবে। সেক্ষেত্রে তাই বাঙালি সংস্কৃতির হারিয়ে যাওয়া সেইসব লোকজ ক্রীড়াগুলি সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তার নিমিত্তে এই গবেষণাপত্রের অবতারণা করা হয়েছে।

Discussion

এক

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে খেলাধুলা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে শতকের পর শতক ধরে। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এবং শরীরচর্চার একক হিসাবে খেলাধুলা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। খেলাধুলা ছিল মানুষের অবসর উপভোগ তথা চিত্ত বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও খেলাধুলা জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল। আজও খেলাধুলা মানব জীবনকে এবং মানব সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। তবে সেক্ষেত্রে বহু পুরনো খেলা বাতিলের খাতায় নাম লিখিয়েছে। যুক্ত হয়েছে বহু নতুন খেলা। যুগের প্রয়োজনে, মানুষের তাগিদে পুরনো খেলাকে ব্রাত্য করে নতুন খেলাকে মানুষ সাদরে বরণ করে নিয়েছে। মানুষ তার ফেলেআসা অতীতকে খেলার মাধ্যমে পুনরুর্জীবিত করে। মানুষ একসময় গুহাবাসী এবং শিকারিজীবী ছিল। সে কারণে এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বালক-বালিকারা বালি দিয়ে গুহা বানায়, স্থাপত্য তৈরি করে, শিল্প তৈরি করে বা শিকার শিকার খেলে। গৃহের অভ্যন্তরে বা স্বল্প পরিসরে বহু খেলা একদা ভারতীয় সভ্যতাকে নিবিষ্ট করে রেখেছিল। বাঙালি জাতিও তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। জনসাধারণ বা সাধারণ মানুষ নিত্যদিনে যে সমস্ত খেলা চিত্তবিনোদনের জন্য খেলত, সেই খেলাগুলো মানুষের জীবনে লোকক্রীড়া হিসাবে পরিগণিত। লোকক্রীড়ার বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য রচিত হয়েছে বিভিন্নরকম আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায়। গ্রামাঞ্চলে খেলাকে উপজীব্য করে অনেক ছড়া রচিত হয়েছে যা খেলোয়াড়দের মন ও প্রাণ সঞ্জীবিত করে তোলে। খেলাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান। খেলতে খেলতে, শরীরচর্চা করতে করতে সেই গানগুলি গীত হয় লোকজীবনে। বাংলার গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার খেলার প্রচলন ছিল। আজ তার মধ্যে বহু খেলা কালের তিমিরে হারিয়ে গেছে, কিছু খেলা হয়তো এখনও অস্তিত্বের সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। আর হারিয়ে যাওয়া খেলাগুলি রচনা করেছে আমাদের স্মৃতি-সত্ত্বা আর ভবিষ্যৎ।

আমরা মানুষ। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন কিছুটা অবসর সময়। মানুষ কেবল ব্যবহারিক জীবনে জীবিকাবহুল কাজ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার অবসর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নিস্পৃহ বিশ্রাম আবার বেদনাদায়ক। এজন্য মানুষের অবসর উপভোগ করার জন্য আমোদ প্রমোদ-স্ফূর্তি দরকার। মানুষ এ যাবৎকাল চিত্তবিনোদনের বহু উপায় ও উপকরণ আবিষ্কার করেছে। নাচ-গান, খেলাধুলা, গল্পগুজব, ভ্রমণ, শিকার প্রকৃতি এর মধ্যে পড়ে। উপযোগিতা ও বৈচিত্রের দিক দিয়ে খেলাধুলা এগুলির মধ্যে সর্বোত্তম মাধ্যম। খেলাধুলার ভেতর দিয়ে মানব জীবনের কতকগুলি প্রধান উপকার সাধিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিকতার মাঝে আবিষ্ট মনের মুক্তি- এ মুক্তি সাময়িক হলেও জীবনযাত্রার পথে নবশক্তি সঞ্চার করে মানব জীবনে। এছাড়াও, শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য রক্ষা; কায়িক সময় সাপেক্ষ খেলাধুলায় শরীরের সুস্থতা ও সবলতা বৃদ্ধি করে এবং মানুষ দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, মূলত জৈবিক প্রয়োজনবোধ থেকে খেলাধুলার রীতি ও কৌশল মানুষ আয়ত্ত করেছে। কয়েকটি খেলার আদি উৎস ও বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায় যে, পূর্বে খেলা অবসর বিনোদনের জন্য, জীবিকার জন্য ও আত্মরক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ রূপেই গণ্য হতো। আদিম অরণ্যচারী মানুষ পশুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতো। পশু ও মৎস্য শিকার করে আহার্য্য উপকরণ মানুষ সংগ্রহ করত। কিন্তু বর্তমানকালে পশু শিকার মানুষের চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে-

> "কুস্তি লাঠিখেলা একসময় আত্মরক্ষার অত্যাবশ্যক উপায় ছিল, পরবর্তীকালে খেলার অঙ্গরূপে অনুশীলিত হয়ে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে এই খেলা। জীবনরক্ষা ও জীবিকার্জনের জন্য নতুন উপায় উদ্ভাবনের সাথে সাথে

> এগুলির অপরিহার্যতা ধীরে ধীরে ঐচ্ছিক ক্রীড়াকৌতুক, আনন্দোপভোগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা দাবা খেলা ছিল কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা। এই খেলাতে বাস্তব যুদ্ধের কলাকৌশল ও রহস্য প্রচ্ছন্ন রূপে দেখা যায়।"[১]

ইতিহাস তার প্রমাণ দেয় যে, এই দাবা খেলায় মানুষের জীবনকে রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কেবলমাত্র মানসিক আমোদ বা স্ফূর্তি ও জৈবিক প্রয়োজসিদ্ধিই নয়, কোনো কোনো খেলার উৎসমূলে আছে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। বাংলার অসংখ্য ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে এবং ছড়ার খেলায় লোক-বিশ্বাস ও মন্ত্রশক্তির প্রভাবের সূত্র বহুকাল পূর্ব থেকে আমরা পেয়ে থাকি। যেমন বৃষ্টি আবাহনমূলক ছড়ার খেলা একটি উল্লেখযোগ্য লোক-খেলা। বৃষ্টিচ্ছায় আকাশের মেঘকে আহ্বান করা হয়ে থাকে-

> "এতে যাদুবিশ্বাসের প্রভাব আছে বলে গ্রাম বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এই ধরনের বিশ্বাস মানুষের শিকড়ের মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং গ্রামীণ জীবনে যাদুবিদ্যা এবং খেলাধুলা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছে।"[২]

খেলাধুলা মানুষের জীবনকে নতুন ধারায় উন্মোচিত করেছে। চিত্তবিনোদন ও শরীরচর্চা খেলার অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কোনো কোনো খেলার ভেতর দিয়ে বুদ্ধির চর্চা, জ্ঞানের চর্চা হয়ে থাকে। ধৈর্য এবং সংযম ভালো খেলোয়াড়ের সবথেকে বড় এবং প্রধান গুণ বলে সারা বিশ্বে পরিগণিত হয়ে আসছে। ধৈর্যের সহিত অনুশীলন যেমন খেলার দক্ষতা অর্জনের উপায়, সুচিন্তিত কৌশল তেমনি শ্রেষ্ঠত্ত অর্জনের সহায়ক। ধাঁধার খেলায় মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়। কোনো কোনো খেলায় গণিত শিক্ষার উপকরণ আছে। বিশেষত লৌকিক খেলায় এগুনটি অধিক লক্ষণীয়ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাংলার ক্রীড়া সংস্কৃতিতে যে খেলাগুলি গাণিতিক মানকে ধরে রেখেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এক্কা-দোক্কা, ১৬ গুটি প্রভৃতি খেলা। এই খেলাগুলির মাধ্যমে সংখ্যা গণনার অভ্যাস বাঙালি সংস্কৃতিতে একেবারে বাল্য অবস্থা থেকেই গড়ে উঠেছে। আবার কতকগুলি খেলা আছে যার অন্তর্নিহিত স্বরূপ মানুষ অনুকরণ করে থাকে। এজন্য বিশেষজ্ঞগণ খেলার মধ্যে অভিনয়ের (Drama/Acting) আদি উৎস অনুসন্ধান করে থাকেন। বাংলার নাগরিক জীবনে বিভিন্ন খেলায় অভিনয় ধর্মটি লুপ্ত, কিন্তু লৌকিক খেলায় বা লোকক্রীড়াতে তা অব্যাহত আছে। কতগুলি খেলা যেমন 'রাজার কোটাল', 'চোর চোর', 'মুঘল পাঠান' প্রভৃতি গ্রাম্য খেলার মধ্যে জীবনের ছবি আবিষ্কার করা যায়। আর এটাই একসময়ের বাংলার সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এর পরিবর্তন হতে থাকে। অবশ্য খেলা সচ্ছন্দতা ও আনন্দ ছেড়ে অভিনয়ের কৌশল দেখানোর জন্য কেউ খেলায় মনোযোগী হয় না। ছড়ার খেলায় কেবল ক্রিয়াগত অভিনয়ের ধর্ম ফুটে ওঠে না, বরং সংলাপগত ধর্মটিও যুগপৎ সংরক্ষিত থাকে। এ সম্পর্কে বিখ্যাত গবেষক পণ্ডিত আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন-

> "অভিনয়ের মধ্যে যেমন দৈহিক ক্রিয়া এবং মৌখিক সংলাপেই একসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ছড়াযুক্ত খেলাতেও তাহাই করিতে হয়, সুতরাং ইহার মধ্যেই যে নাটকের আদিরূপ প্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।" আবার তিনি উল্লেখ করেছেন, 'কানামাছি' খেলায় ছড়া আবৃত্তির সঙ্গে খেলাও চলতে থাকে। যেমন-
> "আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না।"[৩]

এই বলে ছড়াটি আবৃত্তি করতে করতে চোখ-বাঁধা অবস্থায় ছেলে অথবা মেয়ে যেভাবে হাত-পা নেড়ে অন্যদের ছোঁয়ার চেষ্টা করে তাতে মনে হয়, সত্যি সত্যি অপরের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি তার নজর খুবই নগণ্য। মুখের কথাকে সে আঙ্গিক ক্রিয়ায় ফুটিয়ে তোলে। হাডুডু খেলতে খেলতে কোনো কোনো সময় ছড়া বলা হয়। হাডুডু প্রধানত বীরত্বের খেলা। ছড়ার মধ্যে বীরত্বসূচক মন্তব্য করতে করতে খেলোয়াড় দৈহিক অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে তার ভাবটিও প্রকাশ করে থাকে। সে ভাবটি এরকম-

> "একহাত বোলতা তিন হাত শিং।
> উড়ে যায় বোলতা ধা তিং তিং।"[৪]

এভাবে হাত প্রসারিত করে দীর্ঘ 'শিং' এবং বিরোচিত পদক্ষেপ 'ধা তিং তিং' এর আঙ্গিক রূপায়ণ বক্তার অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে ওঠে। অবশ্য এই ভঙ্গির মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং উচ্চকলার নিদর্শন নেই। কথার অর্থ ধরে ভাব ফুটিয়ে তোলা গ্রাম্য খেলা তো দূরের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিক নাচেও তা নেই। খেলোয়াড় তাৎক্ষণিকভাবে যা মনে করে, অঙ্গভঙ্গী দ্বারা তা-ই ফুটিয়ে তোলে। নাটকের পরিভাষায় একে 'Improvisation' বলা হয়ে থাকে।[৫]

খেলাধুলার মাধ্যমে একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের সাহস ও বিক্রম প্রকাশ পায়। প্রতিযোগিতামূলক খেলায় খেলোয়াড়দের মনোবল ও সাহসিকতা অত্যাবশ্যক গুণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবজন্তুর সাথে খেলাধুলাতেও সাহস ও শক্তির

প্রয়োজন হয়। বানর খেলা, সাপখেলা, ভালুক খেলা, পশু শিকার এই শ্রেণির খেলার অন্তর্ভুক্ত। কুস্তি, বক্সিং, লড়াই, লাঠিখেলা প্রভৃতিতে সবল ও সাহসী মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে। তরবারি খেলা রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ। বাজি খেলায় ধৈর্য, সাহস ও কৌশল দরকার হয়। আমাদের দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকে এসব খেলা অধিক চর্চা করে থাকেন। খেলা মাত্রই দলবদ্ধ। একক খেলার আনন্দ তেমন নেই। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে উপভোগের মধ্যে আনন্দ বেশি। একক খেলায় অবসরযাপন হয়, অবসর বিনোদন হয় না। দক্ষতা প্রকাশের আগ্রহ খেলাধুলার অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিদ্বন্দ্বী যেখানে নেই, সেখানে দক্ষতা প্রকাশ করা যায় না। ক্রীড়া কৌতুকাবহমাত্র নয়, সেটা ফলাকাঙ্ক্ষী বটে। প্রতিদ্বন্দিতার ভেতর দিয়ে জয়-পরাজয়ের আনন্দ-বেদনা জড়িত বলে এতে নিষ্প্রীয়তা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা চলে না। খেলার মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা আছে বলেই খেলোয়াড় উৎসাহ পায় ও আনন্দ উপভোগ করে। দলবদ্ধতার জন্য খেলাধুলায় ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ অত্যাবশ্য গুণ হয়ে ওঠে। এতে পারস্পরিক স্বার্থপোলব্ধি, সহযোগিতাবোধ ও নীতিশৃঙ্খলাজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সকল খেলার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়মনিষ্ঠা ও সময়জ্ঞানেরর জন্য খেলার একটা নৈতিক মূল্যও স্বীকৃত হয়।

> "খেলায় খেয়ালখুশির কোনো মূল্য নেই। যেখানে সহযোগিতা আছে, সেখানে সহনশীলতাও আছে। ঐক্য ও শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, সংযম ও সহযোগিতা নৈতিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। খেলাধুলায় মানুষ এ বিষয়ে সবিশেষ শিক্ষা লাভ করে। সামাজিকবোধ খেলার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।"[৬]

খেলার প্রাঙ্গন একটা মিলন তীর্থ। নিঃসঙ্গ মানুষ নিঃস্ব, রিক্ত। পরস্পরের ভাব বিনিময়ে মনের জড়তা কাটে, দীনতা দূর হয়। এতে নিজ দলের এবং প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে মেলামেশা ও ভাব বিনিময়ের ফলে মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। খেলাধুলার উদ্দেশ্য, উপযোগিতা ও অন্তর্নিহিত গুণধর্মের বিচারে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ একে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল-

ক. Games of skill
খ. Games of chance এবং
গ. Games of imitation

তাঁদের মতে, 'skill' বা দক্ষতার খেলায় দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলন হয়। অর্থাৎ শক্তি, সামর্থ্য, কলাকৌশল, ক্ষিপ্রতা, সম্প্রীতি, সহনশীলতা অর্জিত হয়। chance বা ভাগ্যের খেলায় কৌশল প্রয়োগের সুযোগ অল্প। খেলার উপকরণ পদ্ধতির জন্য এরূপ হয়। উদাহরণস্বরূপ 'পাশা' খেলায় ছয়তল বিশিষ্ট গুটির চালের ওপর খেলোয়াড়ের হাত যতখানি, দৈবের হাত তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং এইসব খেলার জয়-পরাজয় দক্ষতার উপর নয়, বরং দৈবের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অবসর বিনোদন ছাড়া এতে অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

> "imitation বা অনুকরণধর্মী খেলায় অবসরযাপনের আনন্দ উপভোগ মূল উদ্দেশ্য। আনুষ্ঠানিক ফল ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনা নেই কিংবা থাকলেও গৌণ এবং নগণ্য।"[৭]

খেলাধুলার প্রকৃতি, অনুশীলন পদ্ধতি এবং স্থান নির্বাচনের দিক থেকে সাধারণভাবে এগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ক্রীড়াবিদগণ এর নাম দিয়েছেন ইনডোর গেমস এবং আউটডোর গেমস। আউটডোর গেমস শ্রমের ও শক্তির খেলা। শক্তি প্রয়োগ আছে বলে বিপদের ঝুঁকিও অনেক। খেলার পদ্ধতি উপকরণ বৈশিষ্ট্যের জন্য উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানের প্রয়োজন হয়। আধুনিক আন্তর্জাতিক খেলাধুলার মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, গল্ফ, প্রভৃতি খেলা এ জাতীয় খেলা।

> "ইনডোর গেমস অপেক্ষাকৃত লঘুশ্রম বা শ্রমহীনের খেলা।"[৮]

শক্তির চেয়ে বুদ্ধির কলাকৌশল প্রদর্শনই খেলার মূল লক্ষ্য। এই খেলার বস্তু উপকরণ এমন যে, প্রাকৃতিক কারণে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। যেমন অল্প বাতাস হলেই টেবিল-টেনিস খেলা অনিষ্ট হয়ে যায়। তাস, দাবা, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি খেলায় হালকা বৃষ্টি হলেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সুতরাং ছায়াযুক্ত অঞ্চলে উপযুক্ত পরিবেশে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত খেলাগুলি নাগরিক এবং অধিকাংশই বিদেশীয় খেলা। বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলাতেও উক্ত বিভাগ সমর্থন করা যায়। হাডুডু, ডাংগুলি, লাঠিখেলা প্রভৃতি আউটডোর গেমস বা বহি:রাঙ্গন ক্রীড়া এবং বাঘবন্দী, কড়িখেলা, বউ-বাসন্তি, পুতুলখেলা ইনডোর গেমস বা অন্ত:রাঙ্গন খেলার অন্তর্ভুক্ত। খেলায় এই জাতিয় বিভাজন স্থূল। দেশজ ও লোকজ খেলায়

নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে পালন করা হয় না, আবার বস্তু উপকরণ এমন নয় যে, স্থান নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। খড়, মাটি, লাঠি, কাঠি, গুটি, কড়ি, বিভিন্ন ফলের বীজ প্রভৃতির সাহায্যে গ্রাম্য খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে কতকগুলি খেলার বৈশিষ্ট্য এমন যাতে ঘর-বাইরের বাছবিচার করা হয় না। দু'চারটি খেলা ছাড়া এ নিয়ে তর্ক বা সমস্যার সৃষ্টি হয় না। ছড়ার খেলায় কোনো বস্তুর প্রয়োজন হয় না। মৌখিক আবৃত্তি করে নিছক আনন্দ উপভোগের জন্য বালক-বালিকারা তা খেলে থাকে। বাংলা গ্রাম্য খেলার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, অনুশীলন পদ্ধতি, খেলার বিষয়ে গুণ এবং স্থান-কাল-পাত্র-ধর্ম নির্বিশেষ অনুধাবন করে বাংলার লোকায়ত খেলাগুলিকে প্রাথমিকভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথাক্রমে -

১. স্থলের খেলা-

ক. **শ্রমসাপেক্ষ শরীরচর্চার খেলা :** হাডুডু, বউছি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, নুনতা, চিক্কা, ল্যাংচা, অ্যাঙ্গা অ্যাঙ্গা, ডাংগুলি, লাঠিখেলা, গাইগোদানি, গাচ্ছুয়া গাচ্ছুয়া, বলি খেলা প্রভৃতি।

খ. **শ্রমহীন আমোদমূলক খেলা :** বাঘবন্দী, ১৬ঘুঁটি, চামড়িখেলা, এক্কাদোক্কা, বৌরানী, কড়িখেলা, গুঁটিখেলা, কানামাছি, উপেন্টি বাইস্কোপ, এলাটিং বেলাটিং, ছি-ছত্তর, রুমালচুরি, ল্যাংচা, কুমির কুমির খেলা ইত্যাদি।

গ. **ছড়া ও ধাঁধার খেলা :** আগডুম বাগডুম, ইকড়ি মিকড়ি, ঘূর্ণিখেলা, রাজার কোটাল, গোলাপ-টগর, কইল্যা, ব্যাঙের মাথা প্রভৃতি খেলা।

ঘ. **আনুষ্ঠানিক খেলা :** কাদামাটি, পাতা খেলা, সাতখোলা, সাতচাড়া, চুঙ্গা খেলা, ঢোপের খেলা ইত্যাদি।

ঙ. **পশু-প্রাণী নিয়ে খেলা :** সাপের খেলা, বানর খেলা, ভালুকের খেলা, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদি।

২. **জলের খেলা-** হোলডুক খেলা, নৌকা বাইচ, লাই খেলা, তইতই খেলা, পানিঝুপ্পা খেলা, ছিলকি খেলা, হট্টিহট্টি খেলা ইত্যাদি।

৩. **অন্ত:রীক্ষের খেলা-** ঘুড়ি ওড়ানো, কবুতর ওড়ানো, বুলবুলির লড়াই ইত্যাদি।

দুই

বাংলার লোকজীবনে যে সমস্ত লোকক্রীড়া প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই আজ বিলুপ্তির পথে। যে সমস্ত লোকক্রীড়া একদা বাঙালির নিত্যদিনের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল সেগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজন।

১. হাডুডু : হাডুডু বাংলায় সর্বত্র প্রচলিত একটি জনপ্রিয় খেলা। জনপ্রিয়তার জন্য একে বাঙালির জাতীয় খেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই খেলাটি শক্তির খেলা। সেজন্য তরুণ ও যুবকেরা এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। অল্প বয়সের বালক-বালিকারা বিদ্যালয়ে স্তরে এই খেলা খেলে থাকে।

> "বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, 'হাঁটু' শব্দ থেকে হাডুডু নামটি এসেছে। হাডুডু খেলার নানা আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায়। যেমন নদিয়া, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে 'কাবাডি', রাজশাহীতে 'কপাটি', ময়মনসিংহে 'চিঞ্জোরানি' রংপুর জেলায় 'টিকটিক' প্রভৃতি।"[৯]

হাডুডু খেলাটি দুটি নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। একটি হলো মাটির ওপর দাগ কেটে সীমানা বেঁধে এবং অপরটি হল সীমানা ছাড়া। প্রথম খেলাটি হয় কোট বন্দী হয়ে এবং দ্বিতীয় খেলাটি হয় কোট ছাড়া। এমনভাবে কোটটি তৈরি করা হয়, যাতে মাঝখানে একটি দাগ কাটা থাকে এবং দুপাশে দুটি ঘর থাকে। খেলা শুরু হলে একপক্ষের যেকোনো একজন মাঝরেখা থেকে শ্বাস বন্ধ করে অপরপক্ষের দলের কাছে যায় কাউকে স্পর্শ করে মেরে আসতে। একে একে দুই পক্ষেরই একজন করে প্রতিনিধি বিপক্ষ ঘরে প্রবেশ করে এবং সবাইকে মোর দেওয়ার চেষ্টা করে। যে দলের সবাই মোর যায় সেই দল হেরে যায়। আবার মোর যাওয়া দল থেকে যদি বিপক্ষ দলের কাউকে আবার মোর দিতে পারে তাহলে পূর্বের মোর যাওয়া খেলোয়ার আবার বেঁচে যায়। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার এই জনপ্রিয় লোক খেলাটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২. বউছি : হাডুডু খেলার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য বউছি খেলায় আছে, তবে নতুনত্ব আছে অনেক। নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতিপক্ষকে তাড়া করা এবং স্পর্শ করে ফিরে এলে প্রতিদ্বন্দ্বীর মারা পড়া ইত্যাদি বিষয়ে মিল আছে। এজন্য বউছির আঞ্চলিক নাম 'বুড়ি কপাটি' খেলা। তবে সামগ্রিকভাবে মিলের চেয়ে পার্থক্য অনেক বেশি। দৌড়ের এবং শ্রমের খেলা

হলেও এই খেলা হাডুডুর মত খেলা নয়। এতে আক্রমণটা একপক্ষীয় বিপক্ষের খেলোয়াড়রা প্রতিরোধ করে না, পালিয়ে স্পর্শ বাঁচায়। গায়ের জোরের চেয়ে পায়ের দৌড়ের ওপর খেলাটি অধিক নির্ভরশীল। সুতরাং হাডুডুর মতো আক্রমণে প্রতি-আক্রমণে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা এতে কম। এজন্য বালক-বালিকারা একত্রে অথবা আলাদাভাবে এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। বয়স্ক পুরুষেরাও এই খেলাটি খেলতে পারে। দল নির্বাচনে ও সংগঠনের সমান বয়স্ক খেলোয়াড় না হলে প্রতিদ্বন্দিতা জমে ওঠে না। বউছি ব্যায়াম সর্বস্ব অত্যন্ত আমোদমূলক একটি লোকক্রীড়া। এতে কোনো বস্তু সরঞ্জাম লাগে না। বউকে ঘিরে বিপক্ষ দলের অবরোধ এবং স্বপক্ষে সহায়তায় সে অবরোধ ভেদ করে বউয়ের মুক্তির চেষ্টার মধ্যে প্রাচীনকালের বিবাহরীতির ছায়াপথ লক্ষ্য করা যায়। শত্রু কর্তৃক অপহরণের ভীতি অতীতে ছিল, এখনো আছে। সেদিক থেকে এটি বেশ কৌশলপূর্ণ ও সতর্কতামূলক খেলা।

৩. গোল্লাছুট : গোল্লাছুট বাংলার একটি আঞ্চলিক লোক খেলা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে একদা এই খেলাটির বহুল পরিমাণে চল ছিল। বিশেষ করে ঢাকা, খুলনা, যশোর, সীমান্তবর্তী নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সহ বাংলার বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে এই খেলাটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন আধুনিক খেলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিযোগিতায় না পেরে এই খেলাটি প্রাচীনপন্থী খেলায় পরিণত হয়েছে এবং কালের গহ্বরে হারিয়ে যেতে বসেছে। পরিমিত সীমানায় দৌড়ে দ্রুততার উপরেই খেলাটির সাফল্য নির্ভর করে। হাডুডু বা বউছির মতো দৌড়ানোর সময় ছড়া করতে হয় না। তবে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার আছে। সমান সংখ্যক দু'দলের মধ্যে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৪/৬ থেকে ৮/১০ জন পর্যন্ত হতে পারে। খোলা মাঠ বা বৃহৎ বাগান এই খেলার প্রশস্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়। একটা ছোট গর্ত খেলার কেন্দ্রিয় সীমানা ধরা হয়। ৪০ থেকে ৫০ হাত দূরে ইট-পাথর অথবা কোনো গাছ বাইরের সীমানা হিসাবে নির্ধারিত হয়। গর্তে একটা কাঠি থাকে, তাকে 'গোল্লা' বলা হয়। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে বাইরের সীমানার গাছটিকে ছোঁয়াই হল এই খেলার মূল লক্ষ্য। আর এ থেকেই এর নাম গোল্লাছুট হয়েছে-

> "এই খেলাতে দলের একজন প্রধান থাকে। অন্যরা 'গোদা' নামে পরিচিত।"[১০]

যে পক্ষ প্রথম দান পায় তারা গর্তের গোল্লা ছুঁয়ে দাঁড়ায়, তখন গোদারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে লম্বা হয়ে প্রধান ব্যক্তিকে ধরে ঘুরতে থাকে। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা সুবিধামতো যে যার স্থান নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের বেষ্টন থেকে যাদের হাত ছুটে যাবে তারা দ্রুত দৌড়ে যাবে দূরের সীমানা স্পর্শ করতে। বিপক্ষ দলের লক্ষ্য এদের ছুঁয়ে বাধা দেওয়া। ছুঁয়ে দিতে পারলে তবেই এরা মারা বা মোর যাবে। দৌড়ের কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই। এলোমেলো ভাবে ছুটে লক্ষ্যস্থলে এসে পৌঁছাতে পারলেই হলো। বিপক্ষেরা ছুলেই খেড়ু মারা পড়ে। যতক্ষণ গর্ত ছুঁয়ে আছে ততক্ষণ নিরাপদ। গর্ত ছেড়ে শেষ পর্যন্ত প্রধান ব্যক্তিকেও ছুটতে হয়। এই প্রধান ব্যক্তিকে বলা হয় 'বুড়ি'। যারা সফলকাম হয় তারা গোল্লা থেকে জোড়া পায়ে একটা করে লাফ দেয় বাইরের সীমানার দিকে। সব লাফ মিলিয়ে উক্ত সীমানায় পৌঁছতে পারলে 'পাটি' হয়। না পারলে অথবা সবাই স্পর্শ দোষে মারা পড়লে বিপক্ষেরা দান পাবে, এ পক্ষের কোনো পাটি গন্য হবে না। পর্যায়ক্রমে গোল্লা পাওয়া এবং প্রতিরোধ করার ভেতর দিয়ে খেলাটি চলতে থাকে। পাটির সংখ্যা অনুযায়ী জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। গোল্লাছুটে শ্বাসরোধ করতে হয় না। দৌড়াদৌড়ির ফলে এতে উত্তম শারীরিক ব্যায়াম হয়। সাধারণত কিশোর বালক ও বালিকারা এই খেলাতে অংশগ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে এই খেলাটি আর সেভাবে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দেখা যায় না।

৪. দাড়িয়াবান্ধা : হাডুডুর মত দাড়িয়াবান্ধা বাংলার সব অঞ্চলের একটি অন্যতম জনপ্রিয় গ্রাম্য খেলা। খোলা জায়গায় নির্দিষ্ট ছক কেটে দাড়িয়াবান্ধা খেলা হয়। বালক-বালিকা এমনকি বয়স্করাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই খেলায় ঘরে সীমানার বাধ্যবাধকতা আছে। ফলে দ্রুত দৌড়ের চেয়ে কৌশল প্যাঁচের উপযোগিতা অধিক। সংযত দৌড়ে এ খেলাটিও শরীরচর্চার প্রকৃষ্ট উপায়। ১৯৮০ সাল নাগাদ এই খেলাটি গ্রামীণ জীবনে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে গ্রামীন বাংলার এই লোকক্রীড়াটি আর সেভাবে তরুণ প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় নয়। সাধারণত ৪/৫ থেকে ৮/৯ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় নিয়ে দাঁড়িয়াবান্ধা খেলার দল গঠন করা হয়ে থাকে। এই খেলায় ঘরের সীমানার বাধ্যবাধকতা আছে, তাই ছক বাঁধা ঘর থাকে। মাটির উপর দাগ কেটে ঘরের সীমানা নির্দেশ করা হয়। স্থান বিশেষে ঘরের কিছু পার্থক্য থাকে। উক্ত ঘরের বিভিন্ন

নাম লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদে 'গাদিঘর', রাজশাহী জেলায় 'বদন ঘর', কুষ্টিয়া জেলায় 'ফুলঘর', খুলনা জেলায় 'রেডিঘর', সহ কোনো কোনো অঞ্চলে 'লবণঘর', বা 'পাকাঘর' নামে পরিচিত। এই খেলায় কোনো ছড়া নেই। এতে সকল খেলোয়াড় সমান দায়িত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ। একজনের অসতর্কতা বা অক্ষমতার কারণে সমস্ত দলের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, দলীয় স্বার্থে পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলার লোক জীবনের কৌম ও সমাজভিত্তিক সমাজ জীবনের আদর্শের পরিচয় বহন করে এই খেলাটি। তাসত্ত্বেও বলতে হয় যে, বর্তমানে এই খেলাটি আর সেভাবে দেখা যায়না। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাঙালির লোকজীবনে এই খেলাটি স্মৃতি হয়ে থাকবে।

৫. চিক্কা খেলা : চিক্কা পুরোপুরি শক্তির খেলা। দু'দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাতে বিপদের খুব ঝুঁকি থাকে। অল্প বয়সের বালকদের পক্ষে এটি খেলা উচিত নয়। মাটির ওপর ১০/১২ হাত লম্বা দাগ কেটে চিক্কার ঘর করা হয়। এতে ৫/৬ জন করে দু'টি দল খেলতে পারে। খেলার শুরুতে এক দল তাদের উপর দাঁড়ায়, অপর দল দাগের একই পাশে বাইরে থাকে। যারা দান পায় তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে হাত বাড়িয়ে চ্যালেঞ্জ দেয়, একে বাংলার অনেকাংশে 'হেতেল' দেওয়া বলে। হাতে হাত মিললে টানাটানি শুরু হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর কেউ অপর দলের কোনো একজনকে টেনে অথবা ঠেলে তার থেকে সরাতে পারলে সে মারা যাবে এবং খেলা থেকে বাদ পড়বে। বিজয়ী খেলোয়াড় দলের অন্যদের সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। এভাবে সবাইকে দাগ থেকে সরাতে পারলে তারা দান পায়। যারা দাগের উপরে আছে তারা নিজ স্থানে অবিচল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পায়ে পা লাগিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। একে 'ল্যাং' মারা বলে। সেই কৃতকার্য হলে প্রতিদ্বন্দ্বী মারা পড়ে। বাইরে সবাইকে ল্যাং মারতে পারলে তারা এক 'চিকা' বা পয়েন্টের অধিকারী হয়। বিপক্ষের যে কোনো খেলোয়াড় ল্যাং বাঁচিয়ে ডাকটি একবার পারাপার করতে পারলে তার দল চিকা পায়। ল্যাং মারার সময় প্রতিপক্ষকে সাবধানে থাকতে হয়। হাত দিয়ে ল্যাং প্রতিরোধ করা হয়। অনেক সময় মাথা পেতে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এতে আঘাত পেয়ে আহত হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। চিক্কা খেলাটি আসলে সীমানার দখল নিয়ে দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধমূলক ক্রীড়া। এতে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনের যুদ্ধ পদ্ধতি প্রচ্ছন্ন থাকে। এখানে কুশলীর চেয়ে বলবানের জয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৬. এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা খেলা : এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা খেলায় নুনতা ও চিক্কা খেলার সংমিশ্রণ আছে। নুনতা খেলায় ঘরের মালিক ডুগ দিয়ে অন্যদের ছুঁয়ে আসে। এখানে সে বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে খেলোয়াড়দের হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। অ্যাঙ্গা অ্যাঙ্গা খেলার পদ্ধতিটা এইরকম- একটা বৃত্তাকার ঘরে জড়ো হয়; -এরা ছাগলের ভূমিকা নেয়। বৃত্তের বাইরে থাকে মাত্র একজন খেলোয়াড়- সে ন্যায় বাঘের ভূমিকা। খেলার শুরুতে বাঘ কপট কান্নার রোল তুললে ছাগলগুলি তার কারণ জিজ্ঞেস করে। এরপর কিছুক্ষণ ছড়ার সংলাপ চলে। সেরকমই একটি প্রচলিত উল্লেখযোগ্য ছড়া হল-

"বাঘ-অ্যাঙ্গা অ্যাঙ্গা (কান্নার সুরে)
ছাগদল-কাঁদ ক্যাঁ (সমস্বরে)?
বাঘ-গোরু হারাইছে।
ছাগদল-কি গোরু?
বাঘ-নাঙ্গা গোরু (ঘরের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে)।
ছাগদল-শিঙ্গি কি?
বাঘ-কুষ্টার আঁশ।
ছাগদল-একটা গান গাওছিন।
[নাচের ভঙ্গিতে ঘুরতে ঘুরতে তখন তারা গান করে।]
এতি চোর, বেতি চোর,
চলে আয় আমার সিয়ানা চোর।"[১১]

গান শেষ করেই বাঘ লাফ দিয়ে বৃত্ত থেকে একটা ছাগলকে ধরে টানতে থাকে। বাঘ নির্দ্বিধায় টেনে নিতে পারেনা, দলের অন্যরা বাধা দেয়, হাত-পা ধরে ঘরের মধ্যে তাকে টেনে রাখতে চায়। ঘরের বাইরে টেনে আনতে পারলে সে বাঘের দলভুক্ত হয় এবং খেলার পুনরাবর্তনের সময় অন্য ছাগলকে টেনে আনতে চেষ্টা করে। শেষ ব্যক্তি যে ঘরে থাকে, সেই

বাঘ হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এইভাবে খেলাটি চলতে থাকে। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অভিনয়ে অ্যাঙ্গা অ্যাঙ্গা খেলার প্রথমাংশ বাকসর্বস্ব কিন্তু এর দ্বিতীয়াংশে শক্তির পরীক্ষা আছে। এতে বাঘ-ছাগলের অভিনয়ে ছদ্ম শিকারের ছবি আছে। চিক্কার আছে যুদ্ধের রীতি, আর অ্যাঙ্গা অ্যাঙ্গা খেলায় আছে শিকারের রীতি। এদিক থেকে এই খেলাটি চিক্কার থেকেও প্রাচীন। কারণ সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের শিকারোপজীবিকা আদিমতম স্তর ছিল। নৃতত্ত্ববিদগণ বাঘ-ছাগলের খেলায় ওই নামের টোটেমগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ও দাসপ্রথার প্রতিফলন আছে বলে মনে করেন।

> "বাঘ বলবান, আর ছাগল নিজের পক্ষে নিয়ে তাকে অন্য ছাগলকে আনার শ্রমে নিয়োজিত করে - এতেই দাসপ্রথার চিহ্ন আছে। বাঘ ও ছাগল নামের টোটেম নরগোষ্ঠী ভারতে বিদ্যমান।"[১২]

৭. ডাংগুলি : ডাংগুলি বাংলার একটি খাঁটি দেশজ এবং সর্বাঞ্চলীয় লোকজ খেলা। পাঁচন আকারের শক্ত ও ঋজু শাখার তৈরি এক হাত পরিমাণ লম্বা লাঠি বা ডান্ডা এবং অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের এক বিঘত পরিমাণ কাঠি বা গুলি এই খেলার প্রধান বস্তু উপকরণ। প্রশস্ত রাস্তা বা মাঠ ডাংগুলি খেলার উপযুক্ত স্থান। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দুজন অথবা দু'দলের মধ্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলাটি কৌশলের খেলা নয়, এতে কোনো ছড়াও বলা হয় না। এটি মূলত বাহুবলের খেলা।

> "ডাংগুলির বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম আছে, যেমন- রাজশাহীতে 'ডান্ডাফুত্তি', ঢাকায় 'ফুত্তিবাড়ি', যশোর জেলায় 'গুলবাড়ি', রংপুরে 'ভ্যাটাডান্ডা', এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে 'ডান্ডাগুলি' নামে পরিচিত।"[১২ক]

আসলে ডান্ডা এবং গুলির নামান্তর থেকেই এইরকম বিভিন্ন ধরনের নামকরণ হয়েছে এই খেলার। ক্রিকেট খেলার সাথে ডাংগুলি খেলার একটা মিল লক্ষ্য করা যায়। ক্রিকেটের ব্যাটসম্যানের এবং ডাংগুলি খেলায় ডান্ডাধারীর একই ভূমিকা। ব্যাট ও বল ডান্ডা ও গুলির প্রায় সমতুল্য বলাই চলে। পিচ আর গর্ত প্রায় অভিন্ন কারসাজির খেলা। ব্যাটসম্যান নানাভাবে আউট হতে পারে। ডাংগুলিতেও আউট করার নানা পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। বলা যায়, গ্রামীণ লোকজীবনে এই খেলাটি ক্রিকেট খেলার গ্রাম্য-সংস্করণ। দুটি খেলাতেই পেশীশক্তি আর বাহুবল দুটিরই প্রয়োজন হয়।

৮. চামড়ি খেলা : উত্তরবঙ্গে ঈদ ও পরবের দিন গ্রামের যুবকেরা চামড়ি খেলা খেলে। খেলার প্রথমে পুকুরের মতো দাগ কাটা হয়। ১৫-২০ জন লাঠিধারী যুবক দাগ ঘিরে জমায়েত হয়। তারাই খেলোয়াড়। একজন সাহসী যুবক লাঠি দিয়ে পুকুর বন্ধন করতে যায়- তখন অন্যেরা তাকে বাধা দিতে আসে এবং তখনই কৃত্রিম লড়াই বেঁধে যায়। তারা বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গিতে খেলা দেখায়। সঙ্গে থাকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। বাদ্যের তালে তালে লাঠি খেলার মহড়া রীতিমতো জমে ওঠে। খেলার বিভিন্ন কৌশল যখন শেষ হয়ে আসে এবং শরীর ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসে তখন সকলে একইসঙ্গে উপরে লাঠি তুলে ধরে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে; আর তখনই আপসে খেলার সমাপ্ত হয়। আসলে, এই খেলাটি লাঠিখেলার প্রায় সমতুল। এই খেলার দ্বিতীয় অংশে আছে ওই পুকুরে কৃত্রিম মাছ ধরার অভিনয়। জল ঢেলে কাদা করা হয় অভিনয়কে জীবন্ত রূপ দেওয়ার জন্য। শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধেছে বলে একজন চিৎকার করে কাতরাতে থাকে। ওঝা এসে ঝাড়ফুঁক শুরু করে। মা, ভাই, বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আসে তার শুশ্রূসার জন্য। কিছুতেই কিছু হয় না, পরিশেষে আসে এক সুন্দরী যুবতী। কাঁটার বিষ মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। সে-সঙ্গে দর্শকের হাস্যকোলাহলের মধ্য দিয়ে খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অংশের পুরো খেলাটাই কৃত্রিম এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকেই কেউ ওঝা, কেউ মা, কেউ বোন, কেউ প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত খেলাটি একটি অভিনয় শিল্প। বাংলার লোকজীবনে এ এক অভিনব চিন্তাভাবনা। খেলার প্রথমাংশ যুদ্ধের এবং দ্বিতীয়াংশ মাছ শিকারকে কেন্দ্র করে পুরো খেলাটি আবর্তিত হয়। পুকুর দখল, জমি দখল, রাজ্য দখল নিয়ে প্রাচীন যুগে প্রায়ই লড়াই হতো। তারই অনুকরণে এই খেলার প্রথম অংশের পরিকল্পনা। তারপর পুকুর দখল হয়ে গেলে মাছ ধরে ভোগের পালা। রাজ্যজয় করে ধন-সম্পতি ভোগদখলে আসে। সুতরাং প্রথমাংশের সাথে দ্বিতীয় অংশের যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মাছ ধরা নিরঙ্কুশ নয়, মাছের কাঁটা ফুটে বেদনা হয়, তার চিকিৎসাও হয়। জনজীবনের একটি অধ্যায়ের অভিনয় চামড়ি খেলার মধ্যে নিহিত আছে। অতীত ইতিহাস ও সামাজিক জীবনচিত্রের দিক থেকে এই খেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

৯. লাঠিখেলা : লাঠিখেলা শক্তি ও কৌশলের খেলা। আত্মরক্ষার জন্য লাঠির ব্যবহার মানুষ আদিমকালেই আবিষ্কার করেছিল। শিকার ও যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে লাঠির ব্যবহার সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। ধাতু ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের পর যুদ্ধক্ষেত্র হতে লাঠির উপযোগিতা ফুরিয়েছে। আমাদের দেশে কিছুকাল আগে পর্যন্ত জমিদারগণ লাঠিয়াল দল রাখতেন

যোদ্ধা হিসেবে। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরানোর পর লাঠি নিয়ে শৌর্যবীর্য ও কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আখড়াগুলি, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বর্তমানে মুসলমানদের মহরম উৎসব উপলক্ষে লাঠিখেলা অনুষ্ঠানের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। ভারতবর্ষের মহরম উৎসব প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে এই প্রথা চলে আসছে বলে ধরে নেওয়া হয়। মহরমে লাঠি খেলে যে কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া হয়, তা সহজেই বোঝা যায়। মহরম ছাড়া ধনীগৃহে বিবাহ উপলক্ষেও লাঠিখেলার আয়োজন করা হয়।

তিন-চার হাত লম্বা ও পরিমিত ব্যাসার্ধের বাঁশের তৈলাক্ত মসৃণ লাঠি এই খেলার অন্যতম উপকরণ। আসরে একজন খেলোয়াড় একহাতে, কখনো দু'হাতে বিভিন্ন কৌশলে লাঠি ঘুরিয়ে খেলা দেখায়। বিভিন্ন চালে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে লাঠি ঘোরানোতেই একজন খেলোয়াড়ের দক্ষতার পরিচয় মেলে। কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়ায় দ্বৈত লাঠিখেলা হয়। এক্ষেত্রে সাহস, কৌশল ক্ষিপ্রতার অতি প্রয়োজন হয়। একক লাঠি খেলায় সামনে, পেছনে, পাশে, আড়াআড়িভাবে, মাথার ওপরে, দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে লাঠি ঘুরানোতেই প্রকৃত সৌন্দর্য ও আনন্দ নিহিত আছে। এটি একটি শ্রমসাপেক্ষ খেলা। এজন্য এতে শরীরচর্চার উত্তম সুযোগ আছে।

> "একমাত্র পুরুষ ও বয়স্ক ব্যক্তি এই খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। মহরমের লাঠিয়াল দলের তরুণেরা থাকে শিক্ষানবিশ হিসাবে।"[১৩]

১০. ল্যাংচা খেলা : ৮-১০ জন ছেলে একত্রে অথবা দুই দলে বিভক্ত হয়ে ল্যাংচা খেলা খেলে থাকে। এক পা হাঁটু বরাবর তুলে অপর পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে একে অপরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। ধাক্কা খেয়ে যে পা ফেলে দেয়, সে খেলা থেকে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে তার জয় হয়। খেলাটি গ্রামীণ বাংলার অন্যতম খেলা চেয়ার খেলার সমতুল। এই খেলাটির আর এক নাম 'মোরগ লড়াই'। খেলাটিতে শরীরচর্চা হয় বলে বিদ্যালয় স্তরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়েরা পৃথকভাবে তা খেলে থাকে। পাশ্চাত্য দেশে এটি 'Lame man' বা খোঁড়ার খেলা নামে পরিচিত।

১১. রুমাল চুরি : বাংলার একটি অন্যতম প্রাচীন লোকক্রীড়া রুমাল চুরি। খেলাটি দলবদ্ধ খেলা। প্রথমে দলের একজন 'চোর' হয়। অন্যরা কেন্দ্রের দিকে মুখ করে গোল হয়ে বসে। চোর হাতে রুমাল নিয়ে চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে যে কোনো একজনের পেছনে সাবধানে এবং অলক্ষে সেটি রেখে দেয়। যার পেছনে রেখেছে সে টের না পেলে চোর ঠিক এক পাক ঘুরে এসে তার পিঠে কিল-চাপড় বসিয়ে দেয়। আগে ভাগে জেনে ফেললে রুমাল নিয়ে সে সরে পড়ে। চোর তার স্থানে বসে। দ্বিতীয় ব্যক্তি একই রকমভাবে ঘুরতে ঘুরতে যে কোনো একজনের পেছনে রুমাল রেখে মারার সুযোগে তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে পারলে মারের পরিমাণ কমে। এভাবে রুমাল চুরি খেলা হয়ে থাকে। চিত্তবিনোদন ও অবসরযাপন ছাড়া অন্য উপকারিতা এতে সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

১২. ঘুঁটি খেলা : এই খেলায় ৫, ৭, ১৬, ৩২ বিভিন্ন ধরনের ঘুঁটির ব্যবহার দেখা যায়। কোথাও কোথাও তেঁতুল বিচি দিয়ে এবং কোথাও বা পাথরের টুকরো দিয়ে এই খেলাটি গ্রাম বাংলায় হয়ে থাকে। ঘুঁটিখেলা পল্লীর মেয়ে মহলে অবসর বিনোদনের একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। পাঁচটি গোলাকার পাথরঘুঁটি খেলার উপকরণ। বিচিত্র ও জটিল পদ্ধতিতে এটি খেলা হয়। হাতের দক্ষতায় ও ক্ষিপ্রতায় খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে। পাঁচটি ঘুঁটির একটি হয় 'ডাগ'। কখনো এক হাতে, কখনো দু'হাতে ডাগের সাহায্যে অন্য ঘুঁটি লোফালুফির ভেতর দিয়ে খেলা চলতে থাকে। লোফালুফির সময় কোনো ঘুঁটি মাটিতে পড়ে গেলে খেলোয়াড় দান হারায়। কড়ি খেলার মতো চক্রাবর্তনে ঘুঁটি খেলা চলে। নানা প্রক্রিয়া শেষ করে যে আগে 'পাকে', তার একটি পয়েন্ট হয়। এরকমভাবে সাত অথবা দশ পয়েন্ট পেলে সে জয়ী হয়। শেষ পর্যন্ত যে হারে তাকে জোড়-বিজোড় ধরে কিল মারার সুযোগ পায়।

> "অভ্যাস ও সংযম আছে বলে একে দক্ষতার খেলা বলা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে এই খেলাটি 'খেইর খেলা' নামে পরিচিত। এর আরেকটি নাম হল 'থাপা খেইড়' খেলা।"[১৪]

১৩. ওপেন্টি বাইস্কোপ, এলার্টিং বেলাটিং : দুজন মহিলা দুহাত উপরের দিকে তুলে পরস্পর হাতে হাত রেখে দাঁড়াবে। আর ৭-৮ জনের একটি দল হাতের ভেতর দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসবে। আবার ভেতরে প্রবেশ করবে। আর মুখে

সুর করে ছড়া বলবে। শেষের শব্দটি বলার সময় যে হাতের মধ্যে থাকবে, তাকে আটকে দেবে এবং খেলার নিয়ম অনুসারে সে মার বা মোর হবে। এভাবে খেলাটি দীর্ঘ সময় ধরে হয়ে থাকে। এই খেলাটি এলাটিং বেলাটিং ছড়ার মাধ্যমে করা হয়-

"আমার নাম জাদুমণি,
যেতে হবে অনেকখানি।"[১৫]

১৪. সাতচাড়া : সাতচাড়া এই গ্রামীণ লোকক্রীড়াটি দু'দলের সমান সংখ্যক ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সংগঠিত হয়। ভাঙ্গা মাটির হাঁড়ি-কলসির সাত টুকরো চাড়া বা খোলামকুচি পরপর ওপর-নিচে সাজিয়ে রাখা হয়। যে দল দান পায়, সে দলের একজন বালক বা বালিকা ৮-১০ হাত দূর থেকে একটি রবার বা টেনিস বল দ্বারা আঘাত করে চাড়া স্তম্ভটি ভাঙার চেষ্টা করে। সে সফল হলে বিপক্ষ দলের ছেলেরা তড়িৎ গতিতে সেটি আবার নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। স্বপক্ষের খেলোয়াড়রা বলটি কুড়িয়ে তাদের আঘাত করতে থাকে। আঘাত বাঁচিয়ে ভাঙা স্তম্ভ জোড়া দিতে পারলে তারা খেলার দান পায়। আর আঘাত করতে পারলে সে 'মারা' যায়। এভাবে সবাই মারা পড়লে এক পয়েন্ট লাভ করে বিজয়ী দল। সাতচাড়া খেলার এটাই নিয়ম। স্তম্ভটি একটি গোষ্ঠীর দুর্গ বা আবাসভূমির প্রতীক; শত্রুপক্ষ তা আক্রমণ করে ভেঙে দিতে চায়। আক্রান্ত দলটা প্রতিহত ও প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সফল হলে জয়ী, ব্যর্থ হলে পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে বিশেষজ্ঞ আর্য কর্তৃক অনার্যদের সপ্তনগরী বা সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের চিত্র অবলোকন করেন।

১৫. পশু-প্রাণী নিয়ে খেলা : গ্রাম বাংলায় বহু খেলা প্রচলিত ছিল একসময়, যেখানে নানা পশুপাখি ও প্রাণী দ্বারা খেলা দেখানো হতো। বর্তমানে পশুপাখি নিয়ে খেলা করানো এবং খেলা দেখার প্রতি চাহিদা অনেকাংশে কমে গেছে। তা সত্ত্বেও একদা আমরা দেখেছি বাংলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পশু ও প্রাণী এবং পাখি দ্বারা নানা ধরনের খেলা প্রদর্শিত হয়। এই খেলাগুলি বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারাকে বহমান করে রেখেছে। বর্তমানে সেভাবে আর এই খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় না। বিশেষ কতকগুলি খেলা আছে যেখানে পশু-প্রাণী নিয়ে নানা কসরত দেখানো হয়। যেমন, ঘোড়দৌড়- শহরের খেলা, পেশাজীবী 'জকি' দ্বারা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়। ষাঁড়ের লড়াই ও মোরগের লড়াই একটি অতি পরিচিত গ্রামীণ লোকক্রীড়া। দক্ষিণ ভারতে গরুকে নিয়ে 'জাল্লিকাট্টু' নামে এক বিশেষ লড়াই খুবই পরিচিত ও জনপ্রিয়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে একদা ষাঁড়ের লড়াই প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেটি আর চোখে পড়ে না। গৃহস্তরা লড়াইয়ের জন্য ষাঁড় যত্ন করে লালন পালন করত। নির্ধারিত তারিখে প্রতিযোগীরা নিজ নিজ ষাঁড় নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হত। কুস্তি খেলার মত একে একে ষাঁড়ের লড়াই হত। সমর্থ্য ও বলবান ষাঁড় জয়ী হলে মালিক পুরস্কৃত হতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে মোরগের লড়াই বেশ ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়। ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে মোরগ লড়াইয়ের জন্য বৃহৎআকার মোরগ লালন-পালন করে লড়াইয়ের জন্য তৈরি করা হয়। এই অঞ্চলে এই মোরগগুলিকে 'যুদ্ধ মোরগ' বা 'পাহুড়' বলা হয়ে থাকে। মোরগের ঠোঁটে এবং পায়ে বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র বেধে দিয়ে যুদ্ধ করানো হয়, যাতে করে বিপক্ষ দলের মোরগগুলি সহজেই পরাজিত হয়। এই লড়াইয়ে পুরস্কার মূল্য ধার্য করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামগ্রী ও অর্থ বাজি রেখে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের আঙ্গিকে মোরগ লড়াই সম্পন্ন হয়। বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য লোকখেলা হলো বুলবুলি পাখির লড়াই। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং সন্নিহিত ঝাড়খন্ড ও উড়িষ্যায় এই খেলা বহুল পরিমাণে প্রচলিত। বাংলার আরেকটি প্রাচীন লোকখেলা হলো সাপখেলা। সাপুড়ে সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করে। সাপুড়ের ঝুড়িতে নানা প্রকার সাপ থাকে। সেগুলি নিয়ে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় এবং উৎসুক দর্শকের সাড়া পেলে ঝাঁপি খুলে এবং বীণ ও তুবড়ি বাজিয়ে সাপকে নানাভাবে নাচিয়ে খেলা দেখায়। বিশেষ করে যাযাবর বেদে জাতির পুরুষ ও নারীরা এই খেলা দেখিয়ে থাকে। বেদেনিরা গীতগেয়ে এইরকম খেলা প্রদর্শন করে। দর্শক সাধ্যমত সাপুড়েকে টাকা-পয়সা, চাল, ডাল, সবজি প্রভৃতি দান করে থাকে। গ্রাম বাংলার আরেকটি অতি জনপ্রিয় খেলা বানর খেলা বা বাদর খেলা। একশ্রেণির বাজিকর গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বানরের খেলা দেখায়। সে উদ্দেশ্যে এরা বানরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বানর বাজি করে নির্দেশ মতো নৃত্য ও অন্যান্য অঙ্গভঙ্গি করে খেলা দেখায়। এমন কি নানারকম অভিনয়ও করে থাকে। বাংলায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত আরেকটি বিশেষ খেলা, ভালুকের খেলার প্রচলন ছিল।

এখন এই খেলাটি বিশেষ দেখা যায় না। ভালুককে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে মালিকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কসরতে খেলা দেখানো হতো। এছাড়াও বিভিন্ন সার্কাস দলে বাঘ, সিংহ, ঘোড়া, হাতি, কুকুর ও অন্যান্য পশু এবং প্রাণীর দ্বারা খেলা দেখানো হয়। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী-পুরুষ আরো অনেক উন্নতমানের ক্রীড়া প্রদর্শন করে থাকে। সার্কাস দল গঠন ও পরিচালনায় অর্থবল ও জনবল প্রচুর পরিমাণে দরকার। সার্কাসকে লোকক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তবে লোকক্রীড়ার অনেক কিছু এতে অঙ্গীভূত হয়েছে। যেমন- সঙ, তারের ওপর বাজিখেলার উৎসব সবই লৌকিক ক্রীড়া।

১৬. নৌকা বাইচ : নৌকা বাইচ নদীনালা খালবিলে ভরা বাংলার একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। এপার বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ অধিক পরিমাণে নদী বেষ্টিত হওয়ার ফলে সেখানে এই খেলাটি অত্যাধিক পরিমাণে প্রচলিত। নদী ও নৌকা বাংলার প্রাণস্বরূপ, যোগাযোগ ও পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। বাঙালির ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মতো সাংস্কৃতিক জীবনেও নদী ও নৌকার প্রভাব গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। পারাপার তথা পরিবহনে নৌকা, মাছ শিকারে নৌকা, জলযুদ্ধে নৌকা, পণ্যবহনে নৌকা, প্রমোদবিহারে নৌকা, বসবাসে নৌকা। মাঝি, জেলে, বেদিয়া বা বেদে, নৌসেনা, সদাগরের জীবন নৌকার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। খেলাধুলার আনন্দোৎসবে ও নৌকার ব্যবহার অপরিসীম। আর এই নৌকাকে কেন্দ্র করে একটি উল্লেখযোগ্য খেলা প্রচলিত বাংলার জনজীবনে- সেটি হলো নৌকা বাইচ। এটি শ্রমের খেলা, শক্তির খেলা, কৌশলের খেলা। এই তিনটি জিনিস নৌকা বাইচ খেলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

> "বাইচ ফারসি বাজি শব্দজাত। মূল অর্থ হল খেলা।"[১৬]

যারা দৈহিক কৌশল বা যাদুর খেলা দেখায় তারা 'বাজিকর'। পণ রেখে খেলার নিয়ম আছে, একে 'বাজিধরা' বলে, আবার খেলায় জয়লাভ অর্থে 'বাজিমাত' আছে। এই খেলায় দাঁড় টানার কসরত দ্বারা, নৌকা চালনার কৌশল দ্বারা প্রতিযোগিতায় জয়লাভের উদ্দেশ্যে আমোদ-প্রমোদমূলক এই খেলার নাম নৌকা বাইচ খুবই সার্থক। কোনো কোনো নৌকা বাইচ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংগঠিত অনুষ্ঠানের সাথে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়। কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছাড়াও নিছক আমোদ-প্রমোদের উৎসবেও নৌকা বাইচ হয়ে থাকে। নদিয়া জেলার শিবনিবাস অঞ্চলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক বছর ১৮ই আগস্ট এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজের মনসা পুজোর পরে ভাসানের অনুষ্ঠানে (১লা ভাদ্র, মনসা পুজোর পরের দিন) নৌকা বাইচ হয়, কিন্তু মনসা পূজার সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র নেই। কারণ নৌকা বাইচ নাহলেও মনসা পূজার অঙ্গহানি হয় না। বহু স্থানে উৎসব উপলক্ষে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয় না। মুসলমান সমাজের কোনো নির্দিষ্ট উপলক্ষ নেই। যে কোনদিন যেকোনো অনুষ্ঠানে তারা নৌকা বাইচের আয়োজন করে থাকে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে যখন খালবিল, নদীনালা জলে ভরাট ও শান্ত থাকে তখন কোনো লোকোউৎসব অথবা জাতীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়।

নৌকা বাইচে যারা দাঁড় টানে তারা 'বাচেলদার' আর যারা গান-বাজনা করে তারা 'সারিদার' নামে পরিচিত। নৌকার দু'পাশে জোরে জোরে বসে বাচেলদাররা দাঁড় টানে, পাটাতনে দাঁড়িয়ে সারিদাররা গান করে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নানা সুরের সঙ্গে বাঁচতে থাকে। ২০/২৫ থেকে ৪০/৫০ জন বাচেলদার ও সারিদার থাকতে পারে। প্রতিযোগিতার নৌকার কোনো পাল এবং মাস্তুল থাকে না। বাইচের দিন নৌকাকে সুসজ্জিত করা হয়। প্রচুর টাকা খরচ করে নৌকা বাইচের নৌকা তৈরি করা হয়। চালের গুঁড়ো ও সিঁদুর দিয়ে আলপনা দেওয়া হয় নৌকার গায়ে ও গলুইয়ে। জলের খেলা বলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় তারা আঁট-সাঁট পোশাক পরে নেয়। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিযোগিরা নাচগান করে ফূর্তি করে। সারিগানের বিষয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেম, লৌকিক প্রেম, নিমাই সন্ন্যাসের পালা ইত্যাদি করে থাকে। বীরত্বব্যঞ্জক, আক্রমণাত্মক এবং আত্মম্ভরিতাজ্ঞাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতার গানও আছে। তালে, মানে, ভাবে, সুরে এগুলি পুরোপুরি নৌকা বাইচেরই গান। কোনো কোনো গানে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শও আছে। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে মাঝিমল্লা যে পীরের দোহাই দিয়ে নৌযাত্রা করে, সে পীর হলেন বদরপীর। বৈঠার টানে নৌকা ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলে আর বৈঠার তালে তালে সমানে গান চলে। নৌকা বাইচে ব্যবহৃত সেরকম একটি গান হল-

> "(ওই) চলে চলে চলে নাও হেইও।
> চল্ চল্ চল্ ভড়াল দিয়া চল্।।
> বদর বদর রবে চল্ হেইও চল্ চল্।

হো হো দ্যাখ দেখি কেবা যায় আগে।।
বদর বদর রবে ধইরা ফেল তারে।
আরে ও চল্ চল্ চল্, বদর বদর রবে চল্।।"[১৭]

বাইচ শেষে বিজয়ী নৌকা ও প্রতিযোগীদের ধানদূর্বা ও বরণডালা দিয়ে বরণ করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ নানাবিধ উপঢৌকন ও অর্থরাশি থাকে। নদীর অধিপতি পবন দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া হয়। নৌকা যখন ঘরে ফেরে তখনও নানাভাবের নাচগান হয়। বিজয়ীর কণ্ঠে উল্লাসের সুর ধ্বনিত হয় এবং বিজিতের কণ্ঠে বেদনার সুর করুণ রসে সমৃদ্ধ হয়। দৌড়ের আগে, দৌড়ের কালে এবং দৌড়ের পরে এসব কিছুকে নিয়েই একটি পূর্ণ নৌকা বাইচ সুসম্পন্ন হয়। এই খেলাটি বাংলার একটি অন্যতম পরম্পরাগত ঐতিহ্য। যদিও বর্তমানে নদীনালায় জলের অভাবে অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও গ্রামীণ জনতা এই আনন্দমুখর খেলায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে না। তাসত্ত্বেও মানুষের ইচ্ছা ও ঐতিহ্যকে রক্ষাকরার তাগিদে এই খেলাটি বাংলার নদীবহুল এলাকায় সংগঠিত হয়ে থাকে।

১৭. লাই খেলা : নাভি থেকে 'লাই' শব্দটি উচ্চারণের ফলে ব্যবহার হতে হতে এসেছে। উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'ন' এর স্থলে 'ল' এবং 'ভি' হয়েছে 'ই'। অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে লাই খেলার প্রচলন আছে। বিভিন্ন প্রেমতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বমূলক লোকসংগীতে গ্রামীণ এই খেলার পরিচয় পাওয়া যায়। বালকদের খেলা গুহ্য প্রেমতত্ত্বের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি প্রমাণিত হয় খেলাটি সমাজজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। বিখ্যাত মরমী দেহতাত্ত্বিক এবং প্রেমতাত্ত্বিক গানের স্রষ্টা মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন কাসিমপুরী লাই খেলার একটি বলিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন। খেলাটি হোলডুগের মতোই, এখানে কেবল নাভি দেখিয়ে খেলা সম্পন্ন হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন-

"একটি ছেলে বুক পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে একহাতে জল নিয়ে অন্যান্য ছেলেকে দেখায় আর বলে-
আমার হাতে কি?
জলই।
এক ডুবে তলই।
তরে যদি পাই।
এক গেরাসে খাই।
এই বলিয়া প্রথম ছেলে ডুব দিয়া পলাইয়া অন্তত নাভি-পানিতে আসিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, আর অন্য ছেলেরা তাহাকে আগেই ডুব দিয়া ধরিবার প্রয়াস পায়। যদি প্রথম ছেলেটি ধরা পড়িবার আগে নাভি-পানিতে আসিয়া নাভি দেখাইয়া 'আঙ্গা-আঙ্গা' বলিতে পারে, তবে তাহার জয় হইল। সে যদি নাভি-পানিতে আসিবার আগেই ধরা পড়িয়া যায়, তবে তাহার পরাজয় হইয়া থাকে; অন্য ছেলে উপরিউক্ত ছড়া বলিয়া আবার লাই খেলা শুরু করিবে।...প্রথম ছেলে ডুব দিয়া ধরা পড়িবার আগে ভাসিতে পারে, আবার ডুব দিতে পারে, তবে ডুবের অবস্থা ব্যতীত তাহাকে ছুঁইলে মারা পড়িবে না, পানির নীচেই ধরা চাই।"[১৮]

১৮. তই তই খেলা : 'তই তই' খেলায় ডুব অথবা সাঁতার অত্যাবশ্যক বিষয় নয়। সাধারণত কোমর পর্যন্ত জলে সকলে গোল হয়ে দাঁড়ায়। একজনের হাতে থাকে একটা ভাসন্ত ফল। উপর থেকে ছুড়ে দিলে কাড়াকাড়ি শুরু হয়- কে আগে দখল নেবে ওই ফলের। হৈ-হুল্লোড় করে ফলটা হস্তগত করাতেই খেলার আনন্দ। তই তই ছড়াযুক্ত খেলা। ছেলেরা হাতে জল টেনে মাতামাতি করে আর মুখে ছড়া বলে। এই খেলায় ব্যবহৃত একটি ছড়া হল-

"তই তই
বগা মারিয়া তলিত থই।
বগা আইল কুঁইয়া
ভূষণ্ডায় খায় চুঁইয়া।"[১৯]

অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই ধরনের ছড়া আকারে গানের মাধ্যমে এই খেলা হয়ে থাকে।

"ডুবে যাওয়ার বিপদ অথবা সাঁতারের শ্রম নেই বলে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা এই খেলাটি খেলে থাকে। ফরিদপুর অঞ্চলে খেলাটি 'ঝাপড়ি' খেলা নামে পরিচিত।"[২০]

এরকমই গ্রীষ্মের তাপদাহে বৃষ্টির আবাহনমূলক একটি ছড়ায় 'ঝাপ্পুরি' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়-

"ঠাকুরদাদার ভাঙ্গা ঘর।
বিষ্টি নামে আড়াইফর।
ঠাকুরদা ও ভাই-
ছিটি ছিটি জল দেরে ঝাপ্পুরি খেলাই।"[২১]

ঝাপ্পুরি এবং ঝাপড়ি অভিন্ন খেলার নাম। ঝাপটা-ঝাপটি শব্দ থেকে ঝাপড়ি, ঝাপ্পুরি শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। বাস্তবে নাম পৃথক হলেও খেলা কিন্তু একই। এই খেলাটি লোকখেলার একটি অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী অববাহিকা অঞ্চলে।

১৯. পানিঝুপ্পা বা ব্যাঙ লাফানো খেলা : পানিঝুপ্পা একটি উল্লেখযোগ্য লোকক্রীড়া। এর অপর নাম 'ব্যাঙ লাফানো' খেলা। পাতলা চ্যাপ্টা মাটির টুকরো বা ভাঙা হাঁড়ি-কলসির চাড়া ডাঙা থেকে জলের ওপরে বিশেষ কায়দায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়। যেভাবে ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে যায়, সেভাবে চাড়াটি জলের ওপরে কিছুদুর গিয়ে ডুবে যায়। এই দৃশ্যটি প্রকৃত উপভোগ্য। কে কতক্ষণ ধরে কতদূর পাঠাতে পারে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়।

"চাড়া দেখতে খলসে মাছের মতো বলে কোনো কোনো অঞ্চলে এটি 'খলসা মাছের খেলা' নামেও পরিচিত। চাড়ার 'খোলামকুচি' নাম থেকে অঞ্চল বিশেষে 'খোলামকুচি' খেলা নামেও এই খেলাটি পরিচিতি লাভ করেছে।"[২২]

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে এইরকম নাম প্রচলিত আছে। এই খেলাটি প্রকৃতপক্ষে জলের লোকক্রীড়া।

২০. অন্তরীক্ষের খেলা : অন্তরীক্ষের খেলার মধ্যে ঘুড়ি ওড়ানো ও কবুতর ওড়ানো প্রধান। আবহাওয়া শুষ্ক ও বাতাস অনুকূল থাকলে ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ উপভোগ করে। প্রতিযোগিতার সময় যুবকেরাও অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 'মাঞ্জা' দিয়ে সুতো ধারালো করা হয়। এরফলে এতে প্যাঁচ দিয়ে প্রতিপক্ষের সুতো কাঁটতে সুবিধা হয়। এটি তৈরি হয় বিশেষ প্রক্রিয়ায়-

"আঠা জাতীয় দ্রব্যের সাথে কাঁচের গুঁড়ো মিশিয়ে সুতো মাঞ্জা দেওয়া হয়।"[২৩]

বিভিন্ন রঙের কাগজ দিয়ে রংবাহারি ঘুড়ি তৈরি করা হয়। ঘুড়ির বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগও লক্ষ্য করা যায়। লাটাইয়ের সুতোর সাথে ঘুড়ি বেঁধে ওড়ানো হয়। খেলোয়াড় সুতোর টেনে ডানে-বামে, ওপর-নিচে অথবা ঘুরপাক খাইয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে থাকে। শিশুরা বাতাসে ভারসাম্য রাখার জন্য ঘুড়ির নিচে কাগজের লেজ জোড়া দিয়ে থাকে। চৈত্রমাসে দিন ধার্য করে এই প্রতিযোগিতা হয়। বাংলার জনজীবনে মকর সংক্রান্তি ও বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটিকে 'ঘুড়ি দিবস' বলে গণ্য করে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। পৃথিবীর নানা দেশে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা প্রচলিত আছে। চীন, জাপানসহ দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলোতে বিচিত্র ধরনের ঘুড়ি দেখা যায়। চীনের অধিবাসী ড্রাগনের ন্যায় বৃহৎ আকার বিশিষ্ট ঘুড়ি তৈরি করে উড়িয়ে থাকে।

পায়রা বা কবুতর পোষা এবং তা ওড়ানোর আনন্দ প্রায় বাংলার সব অঞ্চলেই দেখা যায়। কবুতরের বিভিন্ন জাত আছে। 'গিরোবাজ' জাতের কবুতর খেলার বেশি উপযোগী। সে আকাশে অনেক ওপরে উঠতে পারে এবং নানারূপ ডিগবাজি খেয়ে কসরত দেখাতে পারে। কবুতর দিয়ে কবুতর স্বীকার করার রীতি প্রচলিত আছে বাংলার বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে। কবুতর প্রভুভক্ত অন্যতম জনপ্রিয় পাখি। যত দূরেই যাক না কেন, সে আপন প্রভুর টানে আবার নিজস্ব নীড়ে ফিরে আসে।

২১. গুজি খেলা : নদিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে এই খেলার প্রচলন আছে। এই খেলার পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও নামের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

"বাঘা যতীনের জন্মস্থান কয়া গ্রামে গুজি খেলাকে বলে 'হাপু' খেলা। বাহাদুরপুরে গুজিকে কেউ কেউ বলে 'খুপা' খেলা।"[২৪]

দশজন করে দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে খেলাটি সংগঠিত হয়। যে দল মরা বা মোর হবে তারা পরস্পরের হাত ধরে সারি করে দাঁড়ায়। প্রথমজন দাঁড়ায় এক পায়ের নিচে সামান্য গর্ত করে। তার পা গর্তের বাইরে যাবে না। তারপর একজন করে হাত ধরে লম্বা হয়ে দাঁড়ায়। আর অন্য দলের সদস্যরা চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। এবার মরা দল হাত ধরে গর্তকে কেন্দ্র করে পাক দিয়ে হাতের নিকটস্থ অন্যদের ছুঁতে চেষ্টা করে। অন্যরা ছুটে তাদের ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। এভাবে

পাক দেওয়ার সময় যদি মরা দলের কারো হাত খুলে যায় তবে বিপক্ষ দল তাকে ছুঁয়ে দেবে এবং সে দল বসে যাবে। এভাবে এই খেলাটি সম্পন্ন হয়।

২২. ওল্টু ভাই পল্টু : এই খেলাতে একজন দেহ ভেঙে মাটিতে দুহাত স্পর্শ করে পিঠ নিচু করে থাকবে। অন্যরা একে একে যে মোর হবে তার পিঠের ওপর দিয়ে লাভ মেরে একবার এদিক একবার ওদিক পার হবে। পার হওয়ার সময় পীঠ স্পর্শ করলে হবে না, এবং মুখে যে ছড়াটি বলে পার হবে দম না ছেড়ে তা শেষ করতে হবে।

২৩. লাঙল খেলা : এটি বাংলার একটি অন্যতম লোকক্রীড়া। এই খেলাতে দুজন হাত ধরে থাকবে। ওই হাতের ওপর দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির লাঙ্গল দেওয়ার ভঙ্গিমায় এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ দু'জন গরু অন্যজন চাষি। চাষী মুখে বলবে-

"ডাইনে চল্ হেই বাঁয়ে চল ঢ্যা ঢ্যা' বলে গরুকে খুশি মত চালনা করবে।"[২৫]

২৪. পুতলড়ি খেলা : সাধারণত বর্ষাকালে যখন জমির মাটি নরম থাকে তখন এই খেলাটি করে থাকে স্থানীয় কৃষকরা। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই খেলাটি বহুল পরিমাণে প্রচলিত। এক পক্ষের লড়ি বা লাঠি মাটিতে পোঁতা অবস্থায় থাকে। আর অন্য পক্ষের একজন দূর থেকে ছুটে এসে মাটিতে পোতা লাঠিকে আঘাত করে। এই আঘাতে যদি মাটিতে থাকা লাঠি পড়ে যায়, যে লাঠি আঘাত করে তা মাটিতে পুঁতে যায়, তবে খাটো বা মোর ব্যক্তির জয় সূচিত হয়। এটি বাংলার গ্রামীণ সমাজের একটি অন্যতম লোকক্রীড়া।

২৫. শিলঠোকাঠুকি : শিল ঠোকাঠুকি খেলা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। নদিয়াতে এই খেলা কোথাও কোথাও ঠোক খেলা, বন্দীলড়ি, পাচন খেলা নামে পরিচিত। একটি জমির আকৃতির মত মাটিতে দাগ দিয়ে ঘর কাটা হয়। দাগের চার কোণায় মাটির ঠেলা বসানো থাকবে সীমানা নির্দেশক হিসেবে। দুটি দলে ভাগ হয়ে এক পক্ষ মোর এবং অন্য দল দান হিসাবে খেলবে। যারা দান পাবে তাদের পাঁচজনের লাঠি ঘরের এক কোণে শোয়ানো থাকবে, যারা খাটো তাদের একজন একজন করে ঘরের বাইরে থেকে লাঠি ছুড়ে ওই লাঠি বের করার চেষ্টা করবে।

২৬. হলুদ চাষ : বাংলার একটি প্রাচীন জনপ্রিয় লোকখেলা হলুদ চাষ খেলা। এই খেলায় মাঝে একজন কৃষাণ হয়ে দাঁড়াবে এবং দুই দিকে দু'জন থাকবে গরু হিসেবে। গরুর পায়ের সাথে কৃষানের পা বাঁধা থাকবে। এ অবস্থায় কৃষাণ লাঙ্গলের জমি চাষের মতো ভঙ্গিমা করবে। গরু দু'টি ছুটে পালাতে যাবে এবং কৃষাণ জোর করে তাদের ধরে রাখার চেষ্টা করবে।

২৭. আটুল বাটুল : আটুল বাটুল খেলায় পরপর সারি দিয়ে ১০-১২ জন সামনের দিকে পা প্রসারিত করে বসে যাবে। তার হাত দু'টি থাকবে পেছনের দিকে বাঁধা মতো অবস্থায়। একজন তাদের পায়ে হাত বুলিয়ে ছড়া উচ্চারণ করবে। ছড়া শেষ হলে ওই একজন প্রত্যেকের এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে দেবে এবং বলবে 'ধান উনুনে'। এরপর সে স্নান করতে যাবে। তখন সবাই চিৎকার করবে, 'ধান পুড়ে গেল'। সে তখন স্নান থেকে ফিরে এসে সবার পা ছাড়িয়ে দেবে। সবাই তখন পালাবে। তখন ধান সিদ্ধকারি ব্যক্তি সবাইকে ধরতে যাবে এবং যাকে ধরবে সে মোর হবে। এই খেলাতে যে ছড়াটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেটি হল-

"আঁটুল-বাঁটুল শিমলে শাটুল
শিমলে গেল হাটে
পাকা তেঁতুল খেতে
আর কেঁদোনা আর কেঁদোনা
ছোলাভাজা দেব
এবার যদি কাঁদো তবে
তুলে আছাড় দেব।।"[২৬]

২৮. ঢাকুনঢুকুন : এই লোকক্রীড়াটি বাংলার একটি অন্যতম সামাজিক খেলা। বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের বাড়িতে যখন কনেকে নিয়ে আসা হয়, তখন বাড়িতে প্রবেশ করে এই খেলা এয়োস্ত্রীরা একত্রে কনেকে নিয়ে খেলে। খেলাটিতে চারটি হাড়ি ও চারটি সরা প্রয়োজন হয়। হাঁড়ির মধ্যে রাখা হয় হরিতকি, বয়েরা, সুপারি, যব, তিল ইত্যাদি। হাঁড়ির মুখ ঢাকা থাকে। একে বলা হয় লজ্জা শরম ঢাকা। হাঁড়ির ভেতর থেকে এগুলি কনে বউকে খুঁজে বার করতে হয়।

২৯. কলা খেলা : মাটিতে চৌকোনা ঘরের মাঝখান দিয়ে দু'টি দাগ টানা হয়। চার কোণায় চারটি গুটি রাখা হয়। ওই চারটি গুটি চারজনের। মাঝখানটি হলো মূল পয়েন্ট। যার যার গুটি চাল অনুযায়ী মূল পয়েন্টে অর্থাৎ মাঝখানে উঠতে হবে। অনেকটা লুডুর মত খেলা। এই খেলাটি কলা খেলা নামে পরিচিত।

৩০. খেটো খেলা : বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত হলেও এই খেলাটি নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে অধিক পরিমাণে জনপ্রিয়। এই খেলাটি স্থানভেদে বিভিন্ন নামে যেমন, বৌ-চি, বুড়িচি ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই খেলায় দু'টি দল থাকে। একদলকে বলে খেটো দল। অন্য দলের খেলোয়াড়দের মোর করে বুড়ি ঘরে তুলে আনতে হয়। একটি ঘর থাকে যেখানে খেটোদলের সদস্যরা জমা হয়। সামনে কিছু দূরে ওই দলের একটি বুড়ি বসানো হয়। বুড়ির মাথা ছুঁয়ে অন্য দলের সদস্যদের ছুতে হয়।

৩১. জামাই চুরি খেলা : মাটিতে চারটি গোলাকৃতি ঘর কাটা হয়। আর মাঝখানে থাকে আরেকটি ওইরকম ঘর। চারিদিকে ঘরের চারজন দাঁড়াবে। মাঝখানের ঘরে থাকবে চোর। চারজন পরস্পরের মধ্যে লাফ দিয়ে ঘর বদল করবে। আর চোর সুযোগ বুঝে যে কোনো ঘরে ঢুকে পড়বে। যার ঘরে চোর প্রবেশ করবে সেই ঘরের মানুষ অধিকার হারিয়ে চোর হয়ে মাঝের ঘরে দাঁড়াবে। এই খেলাটি জামাই চুরি খেলা নামে পরিচিত।

৩২. মাংস চুরি : বাংলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য লোকখেলা হল মাংস চুরি খেলা। এই খেলায় দু'পাশে দুটি দল সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন থাকবে রেফারির ভূমিকায়। দু'দলের দু'জনের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে মাঝখানে রাখা ইটের টুকরো বা রুমাল দিয়ে বানানো নকল মাংস অধিকার করার জন্য ছুটে যাবে। আর সুযোগ সন্ধান করবে একে অপরের ছোঁয়া ব্যতীত মাংস তুলে নিজের ঘরে ফিরে যেতে।

৩৩. জলঘটি খেলা : মাঠঘাটে খেলার পাশাপাশি জলকে কেন্দ্র করে খেলাও লোকক্রীড়ার অন্যতম অংশ হিসাবে পরিগণিত। কয়েকজন জলের ধারে হাতে ইটের টুকরা নিয়ে বসে থাকবে। যে গুটি জলে ছুড়বে সে প্রশ্ন করবে, 'ক ঘটি জল খাবি'? অন্যরা বলবে সাতঘটি। সেই অনুসারে গুটির জলে ছুড়বে এবং জলে সাতবার ঢেউ খেলে যেতে হবে।

৩৪. গুটিগদ : সামনাসামনি মুখ করে দুটি দলের সদস্যগণ হাটু মুড়িয়ে বসে থাকবে। দু'দলের দু'জন রাজা এবং রানি মনোনীত হবে। যারা খেলাটি পরিচালনা করবে রাজা তার দলের কারো পায়ের ভাজে গুটি লুকিয়ে রাখবে এবং জিজ্ঞাসা করবে কার পায়ে সেটি রেখেছে। যদি বিপরীত পক্ষ বলতে পারে, তবে তার দল মোর হবে। অর্থাৎ বিপরীত পক্ষ হেরে যাবে।

৩৫. কাঁঠাল চোর : কাঁঠাল চোর খেলায় একজন গাছ, অন্যজন মালিক। গাছকে কেন্দ্র করে পাঁচ-সাত জন ঝুলে থাকবে। যে কাজ হবে সে হাত দু'টো মাথায় রেখে দাঁড়াবে। আর অন্যরা ওই হাতের ঝুলে থাকার ভঙ্গিমায় দাঁড়াবে। দেখে মনে হবে গাছে অসংখ্য কাঁঠাল ঝুলে আছে। তার মধ্য থেকে কাঁঠাল চুরি করতে হবে। এভাবে খেলাটি সম্পন্ন হবে।

৩৬. খোল খেলা : একজন ব্যক্তির পিঠে জোরে জোরে মারবে, যতক্ষণ না মোর ব্যক্তি খোল প্রকাশ করবে। খোল প্রকাশ অর্থাৎ এই মার তার সহ্য সীমার বাইরে গেছে। সে আর মার খেতে পারছে না। যখন হার স্বীকার করবে তখন এই খেলায় অপরপক্ষ জয়ী হবে।

৩৭. চিতে খেলা : সাধারণত পুরুষেরা এই খেলাটিতে অংশ নিয়ে থাকে। মাঝে একটি দাগ কাটা হয়। দাগের এপারে থাকে একজন এবং দাগের ওপারে থাকে অন্যজন দাঁড়িয়ে। উভয়ের মধ্যে হাত ধরে টানাটানি হয়। যার শক্তি ও কায়দা ভালো সে অন্যজনকে দাগের উপরে অর্থাৎ নিজের সীমানায় নিয়ে আসে। এরূপভাবেই খেলাটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৩৮. ইস্টামারি : এই লোকক্রীড়াটিও পুরুষের খেলা। একটি গোল দাগ কেটে ঘর তৈরি করা হয়। সেখানে অবস্থান করে এক দলের সদস্য। আর ঘরের বাইরে থাকে অন্যদলের সদস্যরা। খেলার শুরুতে কিছু সংলাপের পর ভিতরের এবং বাইরের সদস্যরা একে অপরকে টেনে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

৩৯. মাকুখেলা : এই খেলায় একজনের একটি লাঠি মাটিতে শোয়ানো অবস্থায় থাকবে। অন্যজনের কাঁটাযুক্ত লাঠি দিয়ে মেরে ওই লাঠি বিদ্ধ করে মাটিতে গেঁথে রাখতে হবে। যদি গাঁথতে পারে তবে তার জয় হবে।

৪০. নুনভাড়ি খেলা : এই খেলাটিতে চার ঘর বিশিষ্ট করতে চারিদিকে চারজন দাঁড়াবে। মাঝখানে থাকবে একজন খেলোয়াড়। বিপক্ষ দলে থাকবে পাঁচজন একটি ঘরে। শুরু হবে খেলা। বিপক্ষ দলের পাঁচজন সুযোগ বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে পরপর ঘরগুলো স্পর্শ করে প্রথম ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। প্রথম ঘরটিই মূল পয়েন্ট। এই ঘরে যেতে পারলেই তারা জয়ী হবে।

৪১. ইচিং বিচিং খেলা : বাংলার আরেকটি অন্যতম লোকখেলা হল ইচিং বিচিং। এই খেলায় বালক-বালিকা উভয়ে মাটিতে বৃত্তাকারে বসে, হাতের ১০টি আঙ্গুল ছড়িয়ে পেতে রাখে। একজন প্রত্যেকের আঙুল স্পর্শ করে ছড়া বলে। ছড়ার শেষ শব্দটির যার যে আঙুল স্পর্শ করে শেষ হয়, সেই আঙ্গুলটি ভাঁজ করে রাখতে হয়।

> "যার দশটি আঙ্গুলে আগে ভাজ হয় সে প্রথম স্থান অধিকার করে।"[২৭]

৪২. ঝাঁপি খেলা : ছেলেমেয়েরা স্নান করার সময় নদী বা পুকুরের তীরে অবস্থিত গাছে উঠে পুকুরের জলে ঝাঁপ দেয়। পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে যে সবচেয়ে দূরে যাবে সে প্রথম স্থান অধিকার করবে। এভাবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঝাঁপি খেলা প্রচলিত।

৪৩. নুনতা খেলা : নুনতা একটি দলবদ্ধ খেলা। মাটির উপর গোলাকার বৃত্ত এঁকে খেলার ঘর করা হয়। শুরুতে ঘরের মালিক হবে একজন মাত্র। প্রথমে সে থাকবে ঘরের বাইরে, অন্যরা ঘর দখল করে বসবে। বৃত্তের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে মালিক নুনতা গান গাইবে-

> "প্রথমবার 'নুনতা' বললে ঘরের মধ্যে সবাই বলবে 'এক'। পরেরবার নুনতা বললে উত্তর হবে 'দুই'। এরূপে তিন, চার, পাঁচ, ছয়, শেষবার সাত বলার সাথে সাথে ঘরের খেলোয়াড়রা ছুটে বেরিয়ে যাবে, মালিক ফাঁকা ঘরে প্রবেশ করে শ্বাস নিয়ে ওদের ছোঁয়ার জন্য তাড়া করবে। সে যে শ্বাস নিয়ে আছে তা প্রমাণ করার জন্য তাকে ছড়া আবৃত্তি অথবা অর্থহীন ধ্বনি করতে হয়। সে যাকে প্রথম ছুঁয়ে দেবে তাকে টেনে ধরে নিয়ে আসে এবং নিজ দলভুক্ত করে নেয়। সে নুনতা ছড়া গেয়ে মালিককে সাহায্য করে। এরূপে বাইরে সবাইকে একে একে ঘরে আনার চেষ্টা চলে। ছোয়া বাঁচিয়ে সবশেষে যে বাইরে থাকে সে-ই পরের বারের খেলায় ঘরের মালিক হয়। এভাবে চক্রাবর্তনে খেলা চলতে থাকে।"[২৮]

এই খেলাটি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও এই খেলার পদ্ধতিটি প্রায় একই রকমের। বাংলার অনেকাংশে এই খেলাটি 'কুতকুতে' খেলা নামে পরিচিত। নুনতার স্থলে সেখানে 'কুতরে' বলে প্রথমবার ডাকা হয়। খেলোয়াড়রা তখন 'একরে', 'দুইরে', 'তিনরে'... 'সাতরে' বলে উত্তর দেয়। এছাড়া আর কোনো পার্থক্য সেরকম চোখে পড়ে না। অল্প বয়স্ক ছেলে এবং মেয়েরা এই খেলাটি খেলে থাকে। বউছির মতো এ খেলায় কোনরূপ বিপদের ঝুঁকি নেই। দম বন্ধ করে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে শারীরিক ব্যায়ামের উপকারিতা এতে পাওয়া যায়। বাঙালির শরীরচর্চার অন্যতম উপাদেয় হিসাবে এই খেলাটি প্রচলিত।

উপরে উল্লেখিত খেলাগুলির মধ্যে কিছু কিছু খেলা বালক-বালিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার কিছু খেলায় বয়স্করাও অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও বাংলার বিভিন্ন স্থানে তীর খেলার প্রচলন দেখা যায়। এই খেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিকারজীবী মানুষ শিকারে যাওয়ার পূর্বে যাতে তারা সফল হয় সেজন্য ঘর ছাড়ার আগে যাদুমূলক শিকার খেলা করে যেত। এদের বিশ্বাস ছিল ঘরের এই খেলায় জিতলে বনের শিকারেও তারা সফল হবে। এসব খেলার পাশাপাশি আরো অজস্র লোকক্রীড়া বাংলার খেলাধুলার জগতকে প্রশস্ত করে রেখেছিল। চিত্তবিনোদনের জন্য নানারকম খেলাধুলা ছাড়াও সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা, সামাজিক সম্মেলন ও অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল সে সময়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে এগুলি অবক্ষয়ের সম্মুখীন হতে চলেছে। অভিজাত ও উচ্চশ্রেণির লোকেরা মিলন অনুষ্ঠান, মেলা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতেন। লোকখেলার বিবর্তনের এই পথ অনুসন্ধান করলে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক আচার-আচরণের ছাপ পাওয়া যায় এর মধ্যে। বর্তমানের সভ্য সমাজে পরিশীলিত খেলার প্রয়োগ শুরু হয়েছে এই সমস্ত লোকায়ত খেলায়। ফলে বাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রাচীনতম খেলাগুলো ক্রমশ: কোণঠাসা হতে হতে অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে। বহু লোকক্রীড়া আজ বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে উত্তরআধুনিক ও ডিজিটাল যুগে মানুষের হাতে এসেছে নতুন মোড়কে দূরদর্শন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। দূরাভাষের ব্যবহার আজ

সর্বজনবিদিত। ফলশ্রুতি হিসাবে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, মেসেঞ্জার, টেলিগ্রাম, ইন্সট্রাগ্রাম প্রভৃতি সমাজ-মাধ্যমের (Social Media) ব্যবহার দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিনোদনের পরিসর খেলাধুলা থেকে সরে এসে স্মার্ট ফোনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাঁর ফলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকক্রীড়া তার প্রাণ হারাতে বসেছে। অসংখ্য খেলা কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। এটাও ঠিক যে, বর্তমানের আধুনিক খেলার প্রয়োগে হয়তো আগামী দিনে বাংলার এই সমস্ত লোকক্রীড়াগুলি জনজীবন থেকে বিলুপ্তির পথে পা বাড়াবে ও হারিয়ে যাবে। কিংবদন্তির প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র ইতিহাসের নিয়মে স্মৃতিসত্ত্বার পরম্পরা হয়ে থাকবে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে।

তথ্যসূত্র :

১. আহমেদ, ওয়াকিল, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ৫ম সং, ২০১২, পৃ. ২৮৭
২. Leach, Maria (Ed.), Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends (SDFML), Vol. I, Funk and Wagnulls Company, Newyork, 1945, p. 432
৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ৩য় সং, ১৯৬৩, পৃ. ২২৪, ২৬৫
৪. তদেব, পৃ. ২৫৩
৫. আহমেদ, ওয়াকিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮
৬. Leach, Maria (Ed.), op.cit.
৭. Hastings, James (Ed.) Encyclopeadia of Religion and Ethics, Vol.VI, 1954, p. 167
৮. দাসগুপ্ত, বিনোদেশ্বর, বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ, রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, রংপুর, ১ম প্রকাশ, ১৩১৪, পৃ. ১১৫-১১৬
৯. ইজদানি, রওসন, মোমেনশাহী লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৬৪, পৃ. ৮০
১০. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম, মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২৯৪-২৯৭
১১. Hyatt, Harry Middleton, Folklore from Adams County Illinois, London, 1962, pp. 123-124
১২. দাস, অসীম, বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৫৮-৫৯
১২ক. মালিনী ভট্টাচার্য ও অন্যান্য (সম্পা.), নদিয়া জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ২১৩
১৩. ঘোষ, শান্তিদেব, গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পাবলিকেশন্স কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৯৭-৯৮
১৪. ইজদানি, রওসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
১৫. আহমেদ, ওয়াকিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২
১৬. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সংকলিত), বাঙ্গালা ভাষার সরল অভিধান, ২য় ভাগ, কলকাতা, ১৩৩৯, পৃ. ১৫২৯
১৭. সেনগুপ্ত, শঙ্কর, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ২২৪-২২৫
১৮. কাসিমপুরী, মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, লোকসাহিত্যে ছড়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৬৯, পৃ. ৮২
১৯. আহমেদ, ওয়াকিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫
২০. জসীমউদ্দীন, জীবন কথা, ১ম খন্ড, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১১শ সং, ১৩৭৩, পৃ. ২৩
২১. আহমেদ, ওয়াকিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬
২২. ইসলাম, সামিয়ূল, উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১২১-১২৩

২৩. দাস, অসীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৯
২৪. নদিয়া জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, পৃ. ২০৩-২০৪
২৫. হোসেন, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, অবিভক্ত নদীয়া জেলা ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি (১৭৮৬-১৯৪৭ খ্রি.), গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ১৫৯
২৬. নদিয়া জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, পৃ. ২১২-২১৩
২৭. সেনগুপ্ত, শঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯
২৮. আহমেদ, ওয়াকিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬